KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

উনিশ শতকে বঙ্গ-নারীর বিদেশযাত্রা ও সমাজ-সংস্কার

বিক্রমজিৎ দাস
স্নাতকোত্তর ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ :

ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি নারীদের ভ্রমণকাহিনী তাদের ঘরের চার দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসা এবং বদ্ধ সমাজের নারীত্বের বাধা ভেঙে আসা নারীদের মনের উন্মুক্ততার সাক্ষ্য দেয়। এই ভ্রমণগুলি তাদের বিশ্বের অনেক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী তাদের বিশ্ব সম্পর্কে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করে যে নারীরা বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং তাদের নিজস্ব থেকে পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার সময় একটি সমালোচনামূলক এবং তুলনামূলক মনও গড়ে তুলেছিলেন। প্রাথমিক নারীদের ভ্রমণকাহিনীর মূল প্রবণতা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা ছিল কিন্তু সাহিত্যকে সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে দাবি করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলের এই ভ্রমণকাহিনীগুলি ওই সময়কালে নারীদের মধ্যে উদ্ভূত উপলব্ধি, চেতনা এবং সামাজিক মূল্যবোধের একটি নতুন স্তর প্রকাশ করে। বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে, বাঙালি ভদ্রমহিলারা ভারত এবং বিদেশী ভূমির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তুলনা করতেন। এটি একটি আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের মাধ্যম হয়ে ওঠে। তাই এই প্রবন্ধটি নারীর আধুনিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র অন্বেষণ করার একটি প্রচেষ্টা।

মূল শব্দ : ভ্রমণকাহিনী, আত্মপরিচয়, চেতনা, ভদ্রমহিলা, সমাজ-সংস্কার

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষান্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মহতি।"[১]

স্ত্রী-লোক কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধিকারে থাকেন। সুতরাং, কন্যা-জায়া-জননী বৃত্তে নারী শুধুমাত্র পরনির্ভরশীল, ভোগের সামগ্রি- এই ছিল উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান। পরবর্তীকালে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা ক্রমে ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর কর্মজীবনে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে। এরই একটি পরিবর্ধিত ক্ষেত্র ছিল ভ্রমণ, যেখানে প্রাথমিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধিনিষেধকে সঙ্গী করেই এবং পুরুষ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই মেয়েরা প্রথম চেনা সহজাত নিরাপদ পরিবেশ থেকে অচেনা বিপদসংকুল ভিন্ন ভাষা, জাতি, ধর্ম অধ্যুষিত স্থানে যাতায়াত শুরু করে। উনবিংশ শতকে এজাতীয় ভ্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল তীর্থযাত্রা, স্বাস্থ্য উদ্ধার, আত্মীয়-পরিজনের সাক্ষাৎ লাভ ইত্যাদি। প্রারম্ভিক পর্বে এই দূর-গমনের প্রক্রিয়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণ বশত সীমিত থাকলেও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, রেলপথের বিকাশ, পৃথক জেনানা কামরার বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্ব -এ ভ্রমণের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তোলে। এই নতুন অভিজ্ঞতা তাদেরকে এমন এক মুক্তির স্বাদ এনে দেয় যা গ্রন্থপাঠের দ্বারা অজানাকে জানার অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। তার মধ্যেও অধিকতর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় মেয়েদের বিদেশ যাত্রার মাধ্যমে। এ কথা অস্বীকার্য যে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ কতিপয় মহিলারাই লাভকরেছিলেন এবং এরা বেশিরভাগ ব্রাহ্ম পরিবারের অথবা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত উদারবাদী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তবু সমকালীন পর্বে উপনিবেশিক বাংলা থেকে যেসব বঙ্গনারীরা বিদেশে যান তাদের অনেকেই স্বল্প বা দীর্ঘসময়

বিদেশে বসবাসের সুবাদে নিজেদের মনন, চিন্তন তথা বাস্তব অবস্থান ও পরিচিতিকে অনুসন্ধানেও তৎপর ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে উপনিবেশিক বাংলায় নারী আধুনিকতার এক বিশেষ মাধ্যম হিসাবে বঙ্গ-মহিলাদের বিদেশযাত্রা ও দেশে ফিরে তাদের সমাজ-সংস্কার বিষয়টিকে তুলে ধরা হলো।[২]

পিতৃতন্ত্র-এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নারীরা গৃহের অন্দরমহলে হোক বা বাহির জগতে সব ক্ষেত্রেই তারা ছিল পুরুষের নজরবন্দির ঘেরাটোপে। এই বয়েচলা ধারাবাহিক গতানুগতিক পিতৃতন্ত্র থেকে বেরিয়ে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ তথা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও সর্বোপরি স্বদেশে এসে নারীদের সংস্কারী ভূমিকা সত্যিই দৃষ্টান্তপূর্ণ। বিংশ শতকের স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরে জনজীবনে মেয়েদের চলাচল আবদ্ধ হতে থাকে। এই সময় তারা কেবলমাত্র গৃহলক্ষ্মী বা প্রকৃত সহধর্মিনির তকমাতে আবদ্ধ থাকলো না পুরুষদের ন্যায় তারাও নিজেদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে আগ্রহী হয়। যেমন চিকিৎসা, রাজনীতিবিদ, ইউনিয়ন নেতা, দলীয় নেতা, উচ্চশিক্ষার গবেষণা ইত্যাদি কাজেও লিপ্ত হয়। ফলে বিদেশযাত্রা তাদের কাছে আর নিছক ভ্রমণে সীমিত বিনোদনমূলক পরিধিতে সংকুচিত থাকলো না। বরং সাময়িক পারিবারিক আনন্দ লাভে সীমা ছাড়িয়ে তারা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিতে থাকে। শিক্ষালাভ, চারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ, রাজনৈতিক প্রচার, মানব কল্যাণমূলক কর্মসূচি ইত্যাদির জন্য তারা গমন করতে থাকে উনবিংশ শতকে। কৃষ্ণভাবিনি দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিদেশে যাত্রা ও প্রবাসী জীবনের পথে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। পরবর্তীকালে সুনীতি দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, দুর্গাবতী ঘোষ, অবলা বসু, বিনা মজুমদার, সরোজনলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা, সুষমা দেবী, কনক মুখোপাধ্যায়, ড. মৈত্রেয়ী বসু, হেমলতা সরকার, রাজকুমারী দাশ, ৩টিনি দাস, অমলা নন্দী, শান্তা দেবী, রানী ঘোষ, চারুশিলা দেবী, গৌরী ধর্মপাল প্রমুখ হলেন এই পথেরই পথিক।[৩]

কৃষ্ণভাবিনি দেবী ইংল্যান্ডে যান। তিনি সেখানে প্রায় ছয় মাস ছিলেন ও প্রবাসী জীবন-যাপন করে তিনি ব্রিটিশ জনগণ ও সংস্কৃতি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। বিশেষত ইংল্যান্ডের মেয়েদের স্বাধীন জীবনধারা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দেশে ফিরে এসে তিনি বাঙালি পাঠকদের কাছে নারী অধিকার ও নারীবাদ সম্পর্কে বিদেশের অভিজ্ঞতাকে নিজের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। ইংল্যান্ডের নারী স্বাধীনতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বদেশে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন। এমনকি বিধবা নারীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজ জাতির স্বার্থকে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের পিছনে চালিকাশক্তি বলে উপলব্ধি করেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের সমান পরিশ্রম ও কর্ম-ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। শুধু সাংসারিক কর্তব্য পালনই নয় বরং স্কুলে শিক্ষাপ্রদান, পুস্তক ও সংবাদপত্র রচনা, সভায় ভাষণ প্রদান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পুরুষদের সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।[৪]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইংল্যান্ডে প্রবাসী জীবন-যাপনকালে সেখানকার নারীদের অবাধ চলাফেরা, নারী-পুরুষ স্বাধীন মেলামেশার উন্মুক্ত বাতাবরণ প্রত্যক্ষ করেন। ভারতে ফেরার পর ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের নানা প্রকার সাহিত্য রচনা, পুরুষ সহযোগীদের সাথে একত্রে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ওপর উৎসাহ দেন। কেশবচন্দ্র সেন এর কন্যা সুনীতি দেবী ও ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর পাশ্চাত্যের নারী বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে প্রবাসী জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করেন। তার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ।[৫]

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানের এই চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানকে তিনি ভারতের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। এছাড়া ইংল্যান্ডে মেয়েদের স্বাধীনভাবে শিক্ষা লাভও কর্মসংস্থানের মানসিকতাকেও প্রভাবিত করে। তিনি ভারতে ফিরে নিজেকে সেই স্বাধীন মানসিকতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৬]

দুর্গাবতী ঘোষ তার ইংল্যান্ড ভ্রমণ কালে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী যাতায়াতের পথে সড়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করেছেন সেটি তার কাছে অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে মনে হয়েছে। লন্ডনের জনবহুল

পথে মানুষের ভিড় থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখেননি। লন্ডনের অপর একটি দিক থেকে আকর্ষণ করে সেটি হল সেখানকার পথের ভিক্ষুকরা ও কিছু খালি হাতে পয়সা চায় না বরং তারা যে কোন প্রকার বিনোদন বা শিল্প প্রদর্শনের বিনিময়ে তারা পয়সা নেন।[৭]

সরোজনলিনী দত্ত ইংল্যান্ড ও জাপানের দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ পান। সেখান থেকে তিনি পাশ্চাত্য ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্র, জাপানি নারীদের মধ্যে শিক্ষার উচ্চহার, সন্তানকে বাল্যকাল থেকে শৃঙ্খলা ও কর্মনিপুন করে তোলার মানসিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এখানকার মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে সাথে তাদের হাতে কলমে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা করা হয়। সরোজনলিনী অনুভব করেছেন যে, এতে মেয়েদের চরিত্রের উন্নতি হয় তাই তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও চরিত্রের নম্রতা বজায় থাকে। এছাড়া লেখাপড়ার সাথে সাথে মেয়েরা ফুটবল, ভলিবল খেলতেও পারদর্শী। এই সকল প্রত্যক্ষ করে তিনি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শুধু অর্থ উপার্জন নয় বরং জ্ঞান অর্জন হল জাপানি শিক্ষার বিশেষ দিক। দেশে ফিরে এসে তিনি বঙ্গ-মহিলাদের নিয়ে তেমনি এক সংগঠন গড়ে তোলেন। যেখানে মেয়েদের আত্মনির্ভর করে তোলার যাবতীয় চেষ্টা তিনি করেন।[৮]

হরিপ্রভা তাকেদা তার জাপানে বসবাসকালে সেখানকার বাড়ি-ঘর, মানুষের সাজসজ্জা, খাদ্যাভাস, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তিনি জাপানের শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন ফারাক দেখেননি। জাপানিদের ঘর তিনি অতি পরিচ্ছন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দ্রব্যের অতিশজ্জা না থাকলেও ক্ষুদ্র বৃক্ষ, চিত্র দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস দেখেছেন। হরিপ্রভা তাকেদা জাপানে বসবাসকালে সেখানকার যুবশক্তির পরিশ্রমী, সততা, স্বদেশ প্রেমের যে দৃষ্টান্ত দেখেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজের হয়ে বেতারের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নেন। জাপানি মেয়েদের স্কুলে তিনি প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। জাপানের নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষ প্রায় বিরল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এদেশে ২১ বছর বয়সি সকল পুরুষকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সকলে একত্রে কাজ করেন। তাদের মধ্যে কোন বিলাসিতা নেই। জাপানিরা শান্তিপ্রিয় রুচি সম্মত বলে যেভাবে খ্যাত তার পরিচয় তিনি তাদের কথাবার্তা ব্যবহারে উল্লেখ করেছেন।[৯]

বিলেতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। তার সাথে স্ত্রী অবলা বসু ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপানের দীর্ঘদিন প্রবাসী জীবন কাটান। তিনি এ সকল দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ও সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক মননের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। স্বদেশে ফিরে তিনি ভারতীয়দের সার্বিক উন্নতির জন্য এক দিকে নারী শিক্ষা ও অন্যদিকে সক্রিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। বিলেতে জাহাজে চড়ে অবলা বসু ইংল্যান্ডে ইংরেজদের কর্মকৌশলতা, শৃঙ্খলার পরিচয় পান। ইংরেজ জাতির কাজের মধ্যে যেমন একাগ্রতা, তেমনি খেলাধুলার মধ্যেও একাগ্রতা লক্ষ্য করেছেন। এদেশের স্টেশনে ভারতের মতো কোনো হই-হট্টগোল নেই বরং, নীরবে যন্ত্রের ন্যায় সকল কাজ হয়ে চলেছে। বিদেশে ভ্রমণ নারীদের চোখে শুধুমাত্র যে ইতিবাচক রূপে ধরা পড়েছে তা নয় বরং, সেখানকার নেতিবাচকতা ও সমানভাবে তাদের বিচলিত করেছে। অবলা বসু বলেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে যে সকল ধর্ম প্রচারক ভারতে আসেন তারা এ দেশে আকর্ষণ করলেও স্বদেশে ফিরে তারাই আবার ভারতীয়দের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করেন।[১০]

রানী ঘোষ, রাজকুমারী দাস, তটিনি দাস প্রমুখ ইংল্যান্ডে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য যাত্রা করেন। ইংল্যান্ডে সাময়িকভাবে প্রবাসী জীবন-যাপন করেন ও স্বদেশে ফিরে এসে পাশ্চাত্যের উন্নত শিক্ষা ছাড়াকে ভিত্তি করে এখানকার নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাঠ্যসূচি গঠন, শৃঙ্খলা রক্ষা, আধুনিক মনের সাংগঠনিক পরিচালনার কাজে ব্যবহার করেন। তবে উচ্চশিক্ষা লাভের এই প্রক্রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। যেমন, গৌরী ধর্মপাল লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে

গবেষণার ক্ষেত্রে তীব্র জাতি-বৈষম্যের শিকার হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দ্বিজাতীয় অবমাননাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। পুনরায় কোন গবেষণার পথে অগ্রসর না হয়েও তিনি নিজের প্রয়াসে লেডি ব্রেবন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ রূপে যোগ দেন। এইভাবে দেখা যায় বহু বঙ্গমহিলারাই এইসময় বিদেশ যাত্রা ও প্রবাসী জীবন-যাপন করেছেন ও পুনরায় স্বদেশে ফিরে এসে সেই শিক্ষা মূল্যবোধ অভিজ্ঞতাকে স্বদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।[১১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি সেগুলি হল- প্রথমত, নারীদের ভ্রমণভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও আত্মকথনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে যে সংস্কার গুলি হয়েছিল সেগুলি ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ একটি নতুন নারীবাদী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। যেখানে প্রথমবার নারীরা নারীদের সংস্কারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, বিদেশে নারীদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গনারীরা স্বদেশী নারীদের মধ্যেও শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্বদেশী মুক্তি আন্দোলনে নারীদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে বিদুষী নারীদের এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তৃতীয়ত, বঙ্গনারীদের বিদেশ ভ্রমণ কিন্তু পুরুষের হাত ধরেই হয়েছে। সমাজের যে সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষেরা উনিশ শতকের প্রথম থেকে নারীদের সংস্কারের দিকে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল তারা পরবর্তীকালেও নারীদের স্বতন্ত্রভাবে জাগরনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রক্ষণশীল সমাজের গণ্ডিকে পার করে আধুনিকতায় উত্তরণে নারীরা যথেষ্ট সফল হয়েছিল তা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদানের মাধ্যমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। চতুর্থত, বঙ্গনারীরা পাশ্চাত্য নারীদের শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগদানের বিষয়টি থেকে অনুপ্রাণিত হয়নি বরং নারীদের খেলাধুলায়, সংসারের চারুকলায়, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানক্ষেত্রে, গবেষণায় অংশগ্রহণে, পোশাক-পরিচ্ছদে 'অন্দরে ও অন্তরে'-দু ক্ষেত্রেই নারীদের সক্রিয় যোগদান থেকে অনুপ্রানিত হয়েছিল। গৃহের কাজকর্মের পাশাপাশি বাইরের বিভিন্ন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা যেভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল সেগুলিও তারা স্বদেশে ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাগরণ করতে চেয়েছিল ও সফল হয়েছিল।

উনিশ শতক হলো ঔপনিবেশিক ভারতে এমন এক আত্মসমীক্ষার অধ্যায় যখন শাসক শ্রেণী উন্নত সভ্যতার বার্তাকে ভারতীয়রা নিজ ঐতিহ্য থেকে ভিন্ন বৈশাদৃশ্য বলে উপলব্ধি করত। আর যেখানে নারীরা ছিল ভারতীয় পুরুষদের অধীনে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্রটি ছিল অনেকটা উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক মিশেল ফুকো-র 'ক্ষমতা তত্ত্ব'-এর বৈশিষ্ট্যের ন্যায়। যেখানে বায়ো পাওয়ার বা জৈব শক্তির মতো ক্ষমতা নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। 'ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ'-এর মত নারীদের জীবন অতিবাহিত হতো। অন্যদিকে নারীদের 'সেক্সচুয়ালিটি-র বিষয়টিও ছিল পুরুষ অধীনস্ত। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী সমাজ ব্যবস্থা থেকে নারীদের যে অদম্য স্ফুরণ ঘটেছিল তা সত্যিই দৃষ্টান্তপূর্ণ। সমাজে নারীদের এই উত্থানের পেছনে সংস্কারবাদী পুরুষরাই প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। অর্থাৎ 'ক্ষমতা তত্ত্ব'-এর এই শৃঙ্খলাকে নারীদের উপর থেকে পুরুষরাই প্রথম ভেঙেছিল। প্রান্তিক নারীরা কতটা উপকৃত হয়েছিল সেটা যথেষ্ট প্রশ্নতিত বিষয়। লিঙ্গ বৈষম্য সমাজের যে সমস্ত সংস্কারবাদী পুরুষরা বাইরের জগতে নারীদের অধিকার নিয়ে লড়ছিল, ঠিক অন্যদিকে তাদের বাড়ির নারীদের সাথে তারা রক্ষণশীল ভাবেই আচরণ করত। ফলে নারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগরণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর তার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হয় বিংশ শতকে নারীদের বিদেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে। পুরুষ শাসিত বা পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের এই বেড়াজালকে নারীরা ভাঙতে যে সফল হয়েছিল তার বাস্তব প্রতিফলন এর চিত্রটা বিদেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে পর্যবোষিত হয়।

উনিশ শতকে বঙ্গ-নারীর গৃহবন্দী জীবন থেকে মুক্তির আনন্দের স্বাদ নেওয়ার জীবনকে লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তেমনিই অপরিচিত জগত থেকে গৃহীত অভিজ্ঞতা তাদের মননের বিকাশে কতটা সাহায্য করে তারও বিবরণ পাওয়া

যায়। বিদেশে পরিস্থিতিকে স্বদেশের সাথে তুলনা করে তারা নিজ দেশের পাশ্চাৎপদতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণের চেতনাটা ছিল একান্ত নিজস্ব। নারীদের আত্মপরিচয়-পরিসরটির ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ, পেশা গ্রহণ, রাজনীতিতে যোগদান প্রভৃতি যেমন সহায়ক ছিল, তেমনি ভ্রমণযাত্রা ছিল এক অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পর্দানশীল বঙ্গ নারীরা এক গভীর জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক বুদ্ধিমত্তা, স্বাবলম্বীতা, এমনকি চিরাচরিত জাতি, ধর্ম, বর্ণের গণ্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর মানব সত্তার উত্তরণে সহায়ক হয়েছিল। এই ভ্রমণ যাত্রার ফলে বাংলায় নারী ও আধুনিকতার বিশেষ এক মাধ্যম হিসেবে ঔপনিবেশিক সময়ে বঙ্গ নারীদের বিদেশযাত্রা ও তাদের সংস্কার এর অনস্বীকার্য নজির প্রত্যায়মান হয়।

ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বাভোয়া প্রান্তিক নারী কথাটি প্রথম তার লেখায় তুলে ধরেন। নারীরা কেনো প্রান্তিক সেটার সঠিক উত্তর উনিশ শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমজে ফুটে উঠতে দেখা যায়। নারীরা হিন্দু সমজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এর ঘেরাটোপে আবোধ্য ছিলো। বিভিন্ন কু সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে নারীদের ঘরকুনো করে রাখার পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারীরা গৃহে যেমন তার শাশুড়ি বা নিজ মা এর ছত্রছায়ায় থেকে জীবন যাপন করত তেমনি কোথাও বেরোলেও দল বেধে একসাথে বা কোনো পুরুষ ঘেরাটোপে আবোধ্যহয়ে তাদের চলাফেরা করতে হতো। অর্থাৎ সমাজে নারীরা নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর মতো কোণঠাসা জীবন যাপন করতো। এই অবস্থানকে বিচার করলে দেখা যায় মধ্যযুগীয় সময় থেকেই নারীরা প্রান্তিক পরিসরে সমাজে মাথা নত করে জীবন যাপন করেছে। এখন প্রশ্ন হল সব নারীরই কী একই ভাবে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছিলো? সেটা কিন্তু নয়। প্রান্তিকতা শব্দটি সিমোন দ্য বাভোয়া প্রথম উল্লেখ করলেও প্রান্তিকতা চরিত্রটা নারীদের জীবনে মধ্যযুগীয় কাল থেকেই হিন্দু হোক বা মুসলিম উভয় ধর্মের কাছে নারীরা মাথানত অবস্থাতেই জীবন কাটিয়েছে। প্রান্তিক নারী শব্দটির চয়ন তখনও না হলেও কিন্তু নারীকে প্রান্তিক করে রাখার ব্যাপার টা কিন্তু ছিলো। ব্রাহ্মণ পরিবারের নারীরা কিন্তু প্রথম থেকেই পড়াশুনার সাথে যুক্ত ছিলো বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যে থেকেই। পড়াশুনোর বিষয়টা কিন্তু ছিলো ভগবতপাঠ করা, মহাভারত, রামায়ণ এর মতো শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। আর দরিদ্র্য নিম্ন বৃত্ত পরিবারে নারীরা সংসার ভাল করাটাই ছিলো স্বামীর দীর্ঘ আয়ুর সূচক। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে নারীরা সমাজে কতটা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পীড়িত অবস্থায় জীবন কাটাতো। তবে ধীরে ধীরে এই সকল প্রান্তিক নারীরাও সমাজের শিক্ষিত মানুষ এর সংস্কারের ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই শিক্ষার আলোগায়ে মাখতে শুরু করে এবং একে একে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিদেশের মাটিতেও পা রেখে গোড়া ব্রাহ্মন্যবাদী সমাজের কবল থেকে নিজেদের শিক্ষা অর্জন এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। নারীদের জীবনে এই নবজাগরণ সমাজের শিক্ষিত মানুষ এর চিন্তন বিপ্লবের দরুন সম্ভব হয়েছিলো। যার ফলস্বরূপ নারীরা সোনালী সূর্যের আলো গায়ে মেখে যে নতুন রূপরে জাগরণ ঘটিয়ছিল তা আজও বর্তমান সমাজে প্রতীয়মান।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশ চন্দ্র, "মনুসংহিতা", সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৫,পৃ:২৪৮।

২. Sangari Kumkum and Vaid ed. Sudesh "Recasting Women: Essays in Colonial History", New Delhi, 1989.

৩. Forbes Geraldine, ed. Tapan Raychaudhuri "The Memoirs of Dr. Haimabati Sen: From child widow to lady doctor", Roli books, 2000.

৪. দাস কৃষ্ণভাবিনী" ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা', সীমন্তি সেন সম্পা, কলকাতা ১৯৯৬।

৫. দেবী সুনীতি, "Autobiography of an Indian princess", কলকাতা ২০১৮।

৬. Ritt Pratuyash Kumar, "Yakurbahir Sushma, Yari Praghat and Ayasya Context", Dej Prakashi, Calcutta, 1958.

৭. ঘোষ দুর্গাবতী, "পশ্চিম যাত্রিকি", সোমদত্তা মন্ডল অনুবাদিত অনুবাদকৃত, নিউ দিল্লি ২০১০।

৮. দত্ত সরোজ নলিনী, "জাপানে বঙ্গনারী", সীমন্ত্রী সেন সম্পা, কলকাতা ১৯৯৬।

৯. তাকেদা হরিপ্রভা, "বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা ও অন্যান্য রচনা", ১৯১৫।

১০. দাশগুপ্ত দময়ন্তি, "অবলা বসুর ভ্রমণ কথা", কলকাতা ২০১৪।

১১. Forbes Geraldine, "Women in modern India", Cambridge university press, 2008.